Issue cover not available

Vol. 13 | No. 2 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবনী'

Volume	13
Issue	2
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Shamsuzzaman Khan
Published online	December 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i2.1
Pages	1-40
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবনী'

শামসুজ্জামান খান

মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭—১৯১২) আত্মজীবনীমূলক রচনা "আমার জীবনী"র (১৩১৫—১৬) একটি পুরনো কপি সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। 'আমার জীবনী' মীরের একটি প্রধান সাহিত্য কীর্তি (Major work); কিন্তু বইটি দুষ্প্রাপ্য বলে এর ওপর কোন বিস্তৃত আলোচনা এ পর্যন্ত হয়নি। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী লণ্ডনস্থ কমনওয়েলথ রিলেসন্‌স্ লাইব্রেরীতে বইটা দেখেন এবং এর কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ টুকে এনে তাঁর 'মীর মানস'[১] গ্রন্থের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেন। বাংলা আত্মজীবনীর পটভূমিকায় মীরের বইটির মূল্যায়নেও তিনি সচেষ্ট হন। মূলতঃ অধ্যাপক চৌধুরীর কল্যাণেই 'আমার জীবনীর' সঙ্গে পাঠক সমাজের পরিচয় ঘটে। মশাররফ হোসেনের গুণগ্রাহী পাঠক সমাজের অপরিসীম কৌতূহল আরও কিছুটা নিবৃত্ত হবে মনে করেই এ আলোচনার সূত্রপাত করতে প্রয়াসী হয়েছি।

'আমার জীবনী' মীরের অসমাপ্ত আত্মচরিত। এ বইয়ের দীর্ঘ-ঘটনা কালের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মীর পরিবারের জটিল ইতিহাস। মীরের নিজের জীবনের মাত্র আঠার বছরের ঘটনা এতে বিবৃত। একটি পরিপূর্ণ আত্মজীবনী লিখবার ইচ্ছা মশাররফ হোসেনের ছিল। তিনি

১। মীর-মানস ঃ মুনীর চৌধুরী [প্রথম সংস্করণ ১৯৬৫, ঢাকা]

বলেছেন: "জীবনের আদি অন্ত ঘটনা শুনাইব। কম নহে,—বাল্য জীবন হইতে গত ৬৫ বছরের ঘটনা শুনাইব। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের ঘটনাও সময় সময় প্রকাশ করিব। হয়ত যেদিন আমার জীবনের শেষ অঙ্কের যবনিকা পতন হইবে, জীবনীর ইতিও সেই দিন হইবে।"[২] কিন্তু মীরের ইচ্ছাপূর্ণ হয়নি। তাই তাঁর প্রথম বিয়ের শোকাবহ ঘটনা পর্যন্তই স্থান লাভ করেছে।

এই ছেদের কারণ মীরের দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি কুলসুমের মৃত্যু (২৬ শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬)। কুলসুমের মৃত্যুতে মীরের জীবনের সব কিছুই এলো-মেলো হয়ে যায় এবং তিনি 'আমার জীবনীর' চাইতে 'আমার জীবনীর জীবনী' লেখার তাগিদ অনুভব করেন। 'আমার জীবনীর জীবনী' বা 'বিবি কুলসুম' (১৯১০) শেষ করার পর তিনি আর 'আমার জীবনী' রচনায় হাত দিতে পারেননি। ১৯১০ সালে মীরের মৃত্যু সে সম্ভাবনার ওপর যবনিকা টেনে দেয়। বিবি কুলসুম মীরের সর্বশেষ গ্রন্থ।

'আমার জীবনীর' আয়তন বেশ বড়। কিন্তু প্রচলিত মতানুযায়ী এ বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৫ নয়। সম্ভবত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের[৩] তথ্যকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করায় এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। 'আমার জীবনী' খণ্ডে খণ্ডে (মাসে একবার বা দুবার) প্রকাশিত হত। এর সঙ্গে 'গাজী মিয়ঁার বস্তানীর' দ্বিতীয়াংশও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পরে বার খণ্ড একত্র বাধাই করে প্রচারিত হয় এবং এতে পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১৫। কিন্তু 'গাজী মিয়ঁার বস্তানী'র পৃষ্ঠাগুলি বাদ দিলে 'আমার জীবনীর' পৃষ্ঠা সংখ্যা অনেক কমে যায়।

আমাদের হাতে যে বইটা এসেছে তাতে ৪০২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি নাই। মুনীর চৌধুরী সাহেব 'আমার জীবনী'র ৪০৫ পৃষ্ঠা

২। আমার জীবনী পৃঃ ৩।

৩। মীর মশাররফ হোসেন [সাহিত্য সাধক চরিত মালা, ২৯ নম্বর পুস্তিকা (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ৪১ পঞ্চম সংস্করণ ১৩৬২, কলিকাতা।

থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন।[৪] কিন্তু বইটি সেখানেই শেষ কিনা তা বলেননি। উদ্ধৃত অংশে লতিফনের মৃত্যু এবং তাকে সমাহিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। বইটি এখানেই শেষ হয়েছে বলে আমরা অনুমান করি। আমাদের অনুমানের ভিত্তি দুটি, যথা (ক) ঘটনার পরিণতি অনুযায়ী বইটি এখানেই শেষ হওয়া উচিত; (খ) 'আমার জীবনীর' সঙ্গে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র একটা অংশ প্রতি খণ্ডেই ছাপা হবে বলে লেখক 'আমার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি কথায়' ব্যক্ত করেছেন। প্রথম দশটি খণ্ডে এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। অতএব একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ডে (এ দুটি খণ্ড একত্র প্রকাশিত হয়েছিল) যে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র একটা কিস্তিও ছিল এটা অবধারিত। আমরা মনে করি ৪০৬—৪১৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' ছাপা হয়েছিল।

আমাদের অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে 'আমার জীবনী'র পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩৯, আর যদি অনুমান যথাযথ না হয় তাহলে ৩৪৯। 'আমার জীবনী'র ৩০৫ পৃষ্ঠার মধ্যে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র অংশ রয়েছে ৬৬ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থ পরিচিতি

লেখক 'আমার জীবনী'র বিভিন্ন খণ্ডের নামকরন করেছেন এভাবে : 'আমার আত্মকথা : প্রার্থনা' (১) উপক্রমণিকা—আমি কে ? (২) উপক্রমণিকা—আমি কে ? (৩) উপক্রমণিকা—অমি কে ? (৪) উপক্রমণিকা—জন্মবিবরণ (৫) বিদ্যা-শিক্ষা (৬) বিদ্যাশিক্ষা (৭) বিদ্যাশিক্ষা (৮) বিদ্যাশিক্ষা : যৌবন জোয়ারারম্ভ। পরবর্তী খণ্ডগুলির কোন নামকরণ করা হয়নি।

৪। প্রাগুক্ত—পৃঃ ২৩৬।

'আত্মকথা : প্রার্থনা' অংশে লেখক তাঁর তৎকালীন শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিতে যেয়ে 'মৌলুদ শরীফ' (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার অংশ বিশেষ এরকম

"শরীর হয়েছে জরা—বেদনা যাতনা ভরা
আজ এটা কাল ওটা হায়।
শিথিল গায়ের চর্ম্ম—এমনি দেহের ধর্ম্ম
সরস্থানে সরাসন প্রায়॥

শরীরের এহেন অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লেখক জগৎপিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন 'আমার জীবনী' সম্পূর্ণ করার ক্ষমতা দান করেন।

এরপর বইয়ের আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে। আখ্যানভাগকে তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে মীরের বংশপরিচয় ও পারিবারিক ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগে বংশ পরিচয় ও মীরের বিদ্যাশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য এবং তৃতীয় ও সর্বশেষ ভাগে মশাররফের প্রথম বিয়ের প্রেক্ষিত ও শোকাবহ পরিণতি।

লেখক আত্ম-আবিষ্কার করতে যেয়ে নিজের বংশ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বংশের সপ্তম পুরুষ বোগদাদের তাপস-প্রায় সৈয়াদ সাদুল্লা।[৫] সৈয়াদ

৫। মশাররফ হোসেন বলেছেন সৈয়াদ সাদুল্লা পিতৃ অনুসন্ধানে কম হলেও দুশ পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে আসেন (দ্রঃ আমার জীবনী পৃঃ ৪)। কিন্তু এ তথ্যে যে ভুল আছে তার প্রমাণ — মীর সাহেবের পিতার পারিবারিক জীবনের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা ইতিহাস সমর্থন করে। মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ব পুরুষ সৈয়াদ সাদুল্লা। ইতিহাস থেকে জানা যায় তিনি সৈয়দ তোরাবালীর সঙ্গে ১১৮০ হিজরীতে (১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গদেশে আগমন করেন। সৈয়াদ সাদুল্লা থেকে মীর মশাররফ হোসেন পর্যন্ত ষষ্ঠ পুরুষ। —পৃঃ ১১৪-১৫ প্রবন্ধ—বিচিত্রা : সৈয়দ মর্তুজা অলী [প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৫]। আসলে সৈয়াদ সাদুল্লা থেকে মশাররফ হোসেন পর্যন্ত সপ্তম পুরুষ—দ্র : বর্তমান প্রবন্ধের পরিশিষ্ট।

সাহুল্লা ফরিদপুর জেলার সেফাড়া গ্রামে এসে তাঁর গুরুপুত্র সাহ্ সাহ পাহলওয়ানের কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাহ পাহলওয়ান বোগদাদ শরীফ থেকে আগেই এসে সেফাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সৈয়াদ সাহুল্লা পরে সাহ পাহলওয়ানের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে তাঁর আশ্রমেই চিরস্থায়ীভাবে থেকে যান।

সৈয়াদ সাহুল্লা চারপুত্রের জনক। তাঁর পুত্রদের নাম 'আমার জীবনী'তে উল্লেখ করা হয়নি। সৈয়াদের পৌত্র মীর কুতুবুল্লা। মীর কুতুবের পুত্র মীর ওমর দারাজ; ওমরের পুত্র মীর এব্রাহিম হোসেন। ইনিই মীর মোয়াজ্জম হোসেনের পিতা এবং মীর মশাররফের পিতামহ।

মীর এব্রাহিম হোসেনের সময় থেকেই মীর পরিবারের সমৃদ্ধি। তাঁর ভাগ্যবলেই মীরেরা জমিদার। অবশ্য সৈয়াদ সাহুল্লার সময় থেকেই মীরেরা সরকারী আনুকূল্য লাভ করেন। সৈয়াদ সাহুল্লা রাজপ্রদত্ত 'মীর' খেতাবে ভূষিত হন।

মশাররফ হোসেন তাঁর পিতামহের জীবন কথা থেকেই বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এর পূর্ববর্তী পুরুষদের কথা সবিস্তারে বলেননি।

মীরের পিতামহ এব্রাহিম হোসেন বাল্যকাল থেকেই ডানপিটে স্বভাবের। লেখাপড়ার ধার কাছ দিয়েও যেতেন না। লাটিখেলা, তরবারী খেলা, কুস্তি, আর বনে বনে শূকর শিকার করে বেড়ানতেই ছিল তাঁর অপরিসীম আনন্দ। একাজে সঙ্গীরও অভাব ছিলনা। "একদল বলিষ্ঠ গুণ্ডা তাঁহার সেবায় সদাসর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত"।

একদিন শিকার করতে যেয়ে এক ক্ষিপ্ত শূকরের কবল থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান। বাড়ীতে ফেরার পর পিতার আদেশে তাঁর মা তাকে ভাতের সঙ্গে কিছুটা ছাই মিশিয়ে (পিতার আদেশ ছিল শুধুই ছাই দিতে) খেতে দেন। অভিমান বশতঃ এব্রাহিম হোসেন বাড়ি ছেড়ে মুর্শিদাবাদ রওনা হন; উদ্দেশ্য লেখাপড়া শিখবেন।

পথিমধ্যে সাঁওতা গ্রামে এলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। রাত্রি যাপনের

উদ্দেশ্যে তিনি স্থানীয় জমিদার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরদিন সকালে দাসী বাঁদিরা একজন সুপুরুষ ভদ্র সন্তানকে সাধারণ মোসাফিরদের সঙ্গে দেখে কিছুটা অবাক হয় এবং বৃদ্ধা জমিদার আনার খাতুনকে তার সম্বন্ধে জ্ঞাত করে। তিনি কৌতূহলী হয়ে আগন্তককে বাড়ীর ভেতর ডাকিয়ে নিয়ে পরিচয় গ্রহণ করেন। পরিচয় জেনে তিনি বলেন ওমার দারাজ তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং সে সুবাদে এব্রাহিম তাঁর ভাই। তিনি আরও বলেন যে তোমার মুর্শিদাবাদ যাওয়া হবেনা। "আমি মুন্সি রাখিয়া দিতেছি। তুমি আমার এখানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা কর।"

কিছুদিন গত হয়েছে, এব্রাহিম আনার খাতুনের সস্নেহ দৃষ্টিতে ভালই আছেন। ইতোমধ্যে আনার খাতুনের শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। অসুস্থতা ক্রমেই গুরতর আকার ধারন করে। এব্রাহিম আপন পুত্রের ন্যায় তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে থাকেন। আনার খাতুনও এব্রাহিমকে "আপন পুত্রের ন্যায় দৃষ্টি করেন।"

এব্রাহিম হোসেন 'উড়ে এসে জুড়ে বসায়' আনার খাতুনের জ্ঞাতি ভ্রাতারা দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। আনার খাতুনের সন্তানাদি না থাকায় তারাই তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আনার খাতুন গুরুতর রকমের অসুস্থ অবস্থায় বার বার খবর পাঠিয়েও তাদেরকে যাঁওতাত আনাতে ব্যর্থ হলেন। আনার খাতুনের পত্র বাহককে তারা আপমান করে তাড়িয়ে দিল। তিনি প্রতিশোধ নিলেন সমস্ত সম্পত্তি এব্রাহিমের নামে লিখে দিয়ে।

আনার খাতুনের জ্ঞাতি ভ্রাতারা ছিলেন দুর্দান্ত স্বভাবের। তাদের লোকবল ও লাঠিয়াল বাহিনী ছিল। তাই অতি সহজেই তারা এব্রাহিমকে বেদখল করতে সক্ষম হলেন।

৬। অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরী তাঁর "মীর মশাররফ হোসেন" প্রবন্ধে আনার খাতুনকে মশাররফ হোসেনের আপন পিতামহী বলে উল্লেখ করেন। ঐটি একটি মারাত্মক ত্রুটি [দ্রঃ কয়েকটি জীবন [প্রকাশকাল দেখা হয়নি] ঢাকা, পৃঃ ১১৮।

মীর এব্রাহিম আট বছর আনার খাতুনের কাছে ছিলেন। এ সময়ে তিনি প্রজাসাধারণ ও কতিপয় আমলার স্নেহ ভালবাসা পেয়েছিলেন। তাঁদের পরোক্ষ সাহায্য ও সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে প্রায় দুছর পর এব্রাহিম জমিদারী দখলে সক্ষম হন।

মীর এব্রাহিম হোসেনের প্রথম পক্ষের পুত্র মীর জোলফেকার আলী ও মীর মোয়াজ্জম হোসেন। এব্রাহিম হোসেন তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর অপেক্ষাকৃত নিচু ঘরে এক বাল বিধবাকে বিয়ে করেন। এব্রাহিমের বয়স্ক পুত্র কন্যারা এ বিয়েকে ভাল চোখে দেখেন না। এব্রাহিম হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আসার পর পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হয় বলে 'আমার জীবনী'তে উল্লেখ করা হয়।

এব্রাহিম হোসেনের জীবিত কালেই জ্যেষ্ঠ পুত্র জোলফেকার আলী সংসারের ভার গ্রহণ করেন। তিনি বিষয় কর্মে খুব পটু ছিলেন। তাঁর আমলে মীরদের সম্পত্তি যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সংসারের কণ্টক এব্রাহিম হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার পুত্র (মীর সাহেব আলী) কন্যা বাড়ী থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। মীর এব্রাহিম পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে তাদের একটি বাড়ী করে দেন।

এব্রাহিম হোসেনের জীবিত কালেই মীরদের সম্পত্তি ভাগ হয়। ঘোরতর রকমের সাংসারিক জোলফেকার আলী নিজের সুবিধা ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে তিনি ঠকে গেলেন বলে মনে হলেও আসলে তাঁরই হয়েছিল জিত্। কিন্তু তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিলনা। তিনি দুবার বিয়ে করেন। দুঘরের ছিল দুটি মেয়ে। অতএব সমস্ত সম্পত্তির মালিক মীর মোয়াজ্জম হোসেনই হলেন। কিন্তু তিনি বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন না। তাই ভাইঝি জামাই সাগোলা-মাজম কৌশলে তাঁর জমিজমা দখল করে নেয়। আমোদ প্রমোদ মত্ত মীর মোয়াজ্জম হোসেন শেষ দিকে আর্থিক অনটনে পড়ে ঋণগ্রস্ত হন।

মশাররফ হোসেনের পূর্ব পুরুষদের উত্থান ও পতনের কাহিনী এবং

সমান্তরালভাবে মীরদের অন্য শরিক নওয়াব মীর মহম্মদ আলীদের ভাগ্য নির্মাণ ও তার অবক্ষয়ের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে এঁদের পারিবারিক ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে।

বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে মাতামহ মুন্সী জিনাতুল্লার বাড়ীতে মশাররফ হোসেনের জন্ম। লেখক আঁতুড় ঘরের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিলেও অতি জরুরী জন্ম তারিখটি বইয়ে উল্লেখ করেননি।

মীরের বয়স যখন চার বছর তখন তাঁর হাতেখড়ি দেন মুন্সী জমিরুদ্দীন। মুন্সী জমিরুদ্দীন মীরের পিতাকেও হাতেখড়ি দিয়েছিলেন। মশাররফ আলেফ, বে পড়েন মুন্সী হেরাতুল্লার কাছে আর বাংলা পড়েন জগমোহন নন্দীর পাঠশালায়। নন্দীবাবু মীরের পিতার অনুরোধে তাঁর পাঠশালাটি মীরদের বাড়ীতে উঠিয়ে আনেন। মুন্সী কছিমদ্দিনের কাছে মশাররফ হোসেন কিছুদিন ফার্সী ও পড়েছিলেন। মীরের বয়স যখন দশ বছর তখন তাঁর পিতৃবন্ধু সালঘর মধুয়ার নীলকর টি, আই, কেনী ভাল-লেখা পড়ার জন্য মীরকে বিলেত পাঠাবার প্রস্তাব করেন। মীরের পিতামাতা এতে রাজী হলেও মাতামহীর প্রতিকূলতায় এ প্রস্তাব কার্যকর হয়নি।

চৌদ্দ বছর বয়সে মশাররফ হোসেনের মা দৌলতন্নেছা মারা যান। মীরের মাতা-পিতার সম্পর্ক ভাল ছিল না। কারণ মীর মোয়াজ্জম আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকতেন এবং অন্য স্ত্রীলোকের প্রতিও তাঁর আসক্তি ছিল। সম্ভবতঃ এসব কারণেই মৃত্যু শয্যায় শায়িতা দৌলতন্নেছা স্বামীর মুখ দর্শন করেননি।

মা মারা যাওয়ার পর মীরের লেখাপড়ার ব্যাপারে তার বাবা খুব উৎসাহী ছিলেন না বলে 'আমার জীবনী'তে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য কিছু দিনের জন্য লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। এ পর্যায়ে মীরের কাজ ছিল চিঠিপত্র আর হেঁয়ালী লেখা। তাঁর প্রথম হেঁয়ালীটি উদ্ধৃত করছি ঃ

"কামারের মার ফেলে
পাঁঠার ফেলে পা।
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে
বেছে বেছে খা।"[৭]

এ ছাড়া ফার্সীর মুন্সীজির সঙ্গে মীর বিভিন্ন জায়গায় বয়েত বাহাস্ করতে যেতেন। সে বাহাস্ও ছিল নিতান্তই অর্থহীন, "কেবল অক্ষরের মারপ্যাঁচেই হারজিত।"

মীরের মানস-জগতের এই স্থূলতার পাশাপাশি তাঁর ব্যবহারিক জীবনেও ম্লানিমা লক্ষ্য করি। মীরের নিজের কথাতেই শোনা যাক: "প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সত্য কথা বলিব। দাসী বান্দি কর্ত্তৃকই আমার চরিত্র প্রথম কলঙ্ক রেখায় কলঙ্কিত হয়।"[৮]

ষোল বছর বয়সে মশাররফ পিতার সঙ্গে পদমদী যান। মীরের চাচাত ভাই চন্দনমৃগীর জমিদার (পরে নওয়াব) সংস্পর্শে এসে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মীর মহম্মদ আলী তখন তাঁর 'মনমোহিনী' ও মোসাহেবদের নিয়ে মেতে আছেন। যুবক মশাররফ নওয়াবের তাসখেলার সঙ্গী হয়ে তাঁর উদ্ভিন্ন যৌবনা মনমোহিনীর মধুর সান্নিধ্য লাভ করেন।

মহম্মদ আলী চির কুমার ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই সৈয়দ আবদ্দাসামাদের বিয়ে উপলক্ষে তিনি যখন বরিশাল যান তখন মশাররফ হোসেন ও তাঁর বাবাও সঙ্গে গিয়েছিলেন। মশাররফের ভাল জামা কাপড় ছিলনা বলে তিনি বিয়ের মজলিশে যেতে পারছিলেন না। পরে নওয়াব মহম্মদ আলী লোক পাঠিয়ে মশাররফকে তাঁর নিজের কাছে নেন এবং জাঁকজমক পূর্ণ পোশাক পরিয়ে দেন। পরে তিনিও বিয়ের আসরে উপস্থিত থাকেন।

৭। আমার জীবনী—পৃঃ ১৬৫
৮। ঐ ঐ ১৭৭

বিয়েতে বাইজি ও খেমটাওয়ালীদের নাচ গানের ব্যবস্থা ছিল। এ প্রসঙ্গে মীরের বর্ণনা এ রকম: "কি বাইজী কি খেমটাওয়ালির সহিত কথা কহিতে নবাব সাহেবই সকলের অগ্রগণ্য। বাইজী—খেমটাওয়ালীদিগের কথাবার্ত্তা সময়ে বৃহৎ বৈঠকখানা ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পিতাপুত্র জামাতা শ্বশুর মামা ভাগ্নেয় ভাইপো খুড়া পিতৃব্য পরস্পর সকলেই সে স্থানে আছেন। কোন বাধা প্রতিবন্ধক দেখিলাম না। সকলেই স্ত্রীলোক কয়েকটির মুখের দিকে চক্ষুদুটি স্থিরভাবে ফেলিয়া রাখিয়াছেন।"[৯]

বামনা (বরিশাল) থেকে মশাররফ তাঁর পিতার সঙ্গে ঢাকায় যান। ঢাকায় জমিদার পুত্র ওয়াহেদ আলীর বাসায় ওঠেন। ওয়াহেদ আলী মীর জোলফেকার আলীর নাত্ জামাই। তৎকালীন জমিদারদের চারিত্র ধর্ম থেকে ওয়াহেদ আলীও বঞ্চিত ছিলেন না। মশাররফ হোসেন এ সম্বন্ধে বলেছেন: "ওয়াহেদ আলীর মেজাজ ঠিক ছিল না। বারুণী ঠাকুরানীর কল্যাণে চব্বিশ ঘণ্টা উল্‌টে পাল্‌টে উথলে উঠ্‌ত। আর বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না—জামাই।"[১০]

মীরের পিতা এ সময় কিছু গয়না কেনেন। কিন্তু কার জন্য যে কিনলেন সে সম্পর্কে মীর প্রশ্ন রেখেছেন। কারণ তখন তাঁর স্ত্রী বা কন্যা কেউ জীবিত ছিলেন না। এ গয়না কেনার জন্য মীর মোয়াজ্জম হোসেন ওয়াহেদ আলীর বন্ধু ও ঢাকার জমিদার রাধিকাবাবুর কাছ থেকে টাকা ধার করেন। এ কথা শোনার পর ওয়াহেদ আলী মীর মোয়াজ্জেমকে ভর্ৎসনা করেন। পরদিন রাত্রি প্রভাতেই পিতাপুত্র পদমদী যাত্রা করেন।

ওয়াহেদ আলীর একজন হিন্দু শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েক দিনেই মশাররফ হোসেনের বেশ বন্ধুত্ব হয়। তিনি মীরকে বলেন: "আপনাকে আমি একখানা বাঙ্গালা পুস্তক দিব সেই পুস্তকখানা আপনি মনযোগের সহিত বুঝিয়া পাঠ করিবেন। সে পুস্তকখানির লিখা আপনি

৯। প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৩
১০। ঐ ঐ ১৯৮

বুঝিতে পারিবেন না। আর একখানি কেতাব তাহার সঙ্গে খরিদ করিয়া দিতেছি। যে কথাটা আপনি বুঝিতে না পারেন সে কথাটা সেই পুস্তক মধ্য হইতে বাহির করিয়া পড়িলেই তাহার মানে বুঝিতে পারিবেন। কি কৌশলে মানে বাহির করিতে হয় দেখাইয়া দিব।·····সন্ধ্যার সময় দুখানি বাঙ্গালা পুস্তক আমার হাতে দিয়া পুনরায় বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যেরূপে কোরাণ শরীফ পাঠ করে, নামাজের উপাসনায় মন্ত্র পাঠ করে, খোতবা পাঠ করে সেরূপ পড়িবেন না। প্রত্যেক শব্দের মানে বুঝিয়া পাঁচ ছয় ছত্র করিয়া পড়িতে পড়িতে পুস্তকখানি শেষ করিবেন। ···· মানে বুঝিয়া পড়িবেন। আর সেই শব্দটা কিভাবে লিখা আছে—কি কি অক্ষর দ্বারা লিখিয়াছে তাহাও মনে রাখিবেন। আপনি মুসলমানি পুথি পড়িতে পারেন জানি। কিন্তু এ কেতাব সেভাবে অনর্গল পড়িতে পারিবেন না। পারিবেন না বলিয়া ফেলিয়া রাখিবেন না। না হয় একছত্র করিয়া পড়িবেন। বার বার পড়িবেন।”[১১]

ওপরে যে বই দুইটির কথা বলা হয়েছে তার একটি ‘কাদম্বরী’ অন্যটি ‘শব্দার্থ প্রকাশিকা’। মীর এ প্রসঙ্গে বলেছেন: “সেই দিন হইতেই আমি কাদম্বরী পুস্তক চুপি চুপি পড়িতে লাগিলাম। আর পুস্তক-গুরুজির সাহায্যে অর্থ বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আমার নিকট ‘কাদম্বরী’ বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইল। সুর করিয়া পড়া যায় না। পদে পদে মিল নাই।....যাহা পড়ি তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারি না।...তবে আমি যে তিন পাতা পর পর পড়িয়া প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, ‘শব্দার্থ প্রকাশিকা’ দেখিয়া ভাব অর্থটা কথঞ্চিত ভাবে বুঝিয়া ছিলাম, তাহাই বুঝিতাম। ··· যাহা হউক আমি বিরক্ত হইয়াও ‘কাদম্বরী’ আর অভিধান ছাড়িলাম না। ঐ দুইখানি পুস্তক আমার সঙ্গের সাথী হইল।”[১২]

১১। প্রাগুক্ত পৃঃ ২০০—১

১২ প্রাগুক্ত পৃঃ ২০৯-১০

এরপর কিছুদিন পদমদী ও লাহিনী পাড়ায় কাটিয়ে মশাররফ ও তাঁর এক ভাই কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্তি হন। এখানে পড়াশুনা বেশ ভালই চলছিল। এ সময়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন উমেশ চন্দ্র সরকার। কুষ্টিয়া স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে কলকাতায় যান। ফলে এ স্কুল থেকে তাকে সরিয়ে পদমদীর নবাব স্কুলে ভর্তি করা হয়। পদমদীর নবাব স্কুলে পড়াশুনার কোন পরিবেশ ছিলনা। নবাবের আমোদ-প্রমোদের ভীষণ ধারার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে শেষে বদনাম ও লোকলজ্জার ভয়ে পদমদী ত্যাগ করেন।

পদমদীর পর মীর ভর্তি হলেন কৃষ্ণনগর কলেজে, পঞ্চম শ্রেণীতে। তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেনঃ "ও ক্লাশের মাষ্টার বিখ্যাত গুরুদাস বাবু—দি মহেশচন্দ্র দত্ত সে সময় প্রিন্সিপাল—বাঙ্গালা পড়া আর হইল না। যে পড়া সে নামমাত্র পড়া—ইংরেজী পড়িতে লাগিলাম।"[১৩]

কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে মশাররফ আবার কলকাতায় যান। কলকাতায় মশাররফের পিতৃবন্ধু ও পাবনার প্রাক্তন আমিন নাজির হোসেনের বাসায় উঠেন। নাজির হোসেন মশাররফকে কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতে বলেন। তিনি এ ব্যাপারে পত্র লিখে মীরের পিতার সম্মতিও নেন।

নাজির হোসেনের কলকাতার বাসা থেকে কিছুদিন পর তাকে যশোরের মক্তারপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। মক্তারপুরে নাজির হোসনের গ্রামের বাড়ী। মীর এখানে থাকেন, খান আর 'প্রভাকর' ও গ্রাম বার্তায় সংবাদাদি ও প্রবন্ধ লেখেন। আর নাজির হোসেনের খানসামা যাদু তাঁর কাছে ঘুরঘুর করে, হাত পা টেপে এবং শেষ পর্যন্ত নাজির হোসেনের বড় মেয়ে লতিফনকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কয়েকদিন লেগে থাকার পর মীরের মনে রং ধরে।

পিতাকে না জানিয়ে[১৪] মীর বিয়েতে সম্মতিদান করেন। ১২৭২ সালের

---

১৩ ঐ ঐ ২৮৬

১৪ মীর শেষ পর্যন্ত পিতাকে সংবাদ দিয়েছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 'আমার জীবনী' পাঠে জানা যায় যে, তা সত্য নয়।

৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার (১৯শে মে ১৮৬৫) বিয়ের দিন ধার্য হয়। মীর বিয়ের অগে তিনমাস সময় হাতে পান। এ সময়ের মধ্যে তাঁর ও লতিফনের মধ্যে পত্রবিনিময় ও প্রগাঢ় প্রেম জন্মে। একে অপরকে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকেন।

লতিফননেছা ও তার ছোট বোন আজিজন নেছার একই দিনে বিয়ে হওয়ার কথা। বিয়ে পড়ানো হয়ে গেলে দেখা যায় আজিজনের সঙ্গে মীরের বিয়ে হয়ে গেছে। আজিজনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল জনৈক হোসেন আলীর সঙ্গে। সে লোকের অনেক বয়স, দাঁত পড়েছে কয়েকটি, দেখতে কদাকার আবার ঘরে বউ আছে। ষড়যন্ত্র করে কনে বদল করা হয়েছিল। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে লতিফন গুরুতর রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েকদিন পর মীরের জানুর ওপর মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আত্মচরিত হিসাবে আমার জীবনী

আত্মচরিতে আমরা দুটি জিনিস বিশেষ ভাবে পেতে চাই, তা হল— 'ব্যক্তি' হিসাবে চরিতকারের আত্মবিকাশের বিশ্বস্ত বর্ণনা এবং তাঁর স্বকালের বিবর্তন ধারার একটি রূপরেখা। এ নিরিখে দেখলে এ বইয়ের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই স্বীকার্য। 'ব্যক্তি' হিসাবে সম্পর্কিত ঘটনা প্রবাহের রূপায়ণে মীর সব সময়ে বস্তুনিষ্ঠ (objective) নন। তার কারণ বোধ হয় এই যে, এ বইয়ের একটি বড় অংশ জুড়ে যে আখ্যান-ভাগ গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা পরোক্ষ। শোনা কথার (তিনি তার মাতামহীর কাছ থেকে পারিবারিক ইতিহাস ও তাঁর বাল্য কালের কথা শোনেন) ওপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে। আর এ কথা কেনা জানে যে, ঘটনা নিচয় কান থেকে কানে পল্লবিত হয়েই প্রচারিত হয়। এ ধরণের পরিবেশে গ্রহণ-বর্জনের যে বৈজ্ঞানিক পন্থা রয়েছে তা ছিল মীরের

অনায়ত্ত। তবুও তিনি ঘটনাবলীর প্রামাণ্য বর্ণনায় সচেষ্ট ছিলেন এ কথায় স্বাক্ষর বইয়ে রাখতে পেরেছেন। দ্বিতীয়তঃ কালের বিবর্তন ধারার রূপটি এ বইয়ে পুরোপুরি পাওয়া না গেলেও মীরের কৃতিত্ব এখানে সে মুসলিম সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়ের রূপটি এ বইয়ে বড় চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে।

এবার 'আত্মচরিত' সম্পর্কে মীরের দৃষ্টিভঙ্গী কি তা দেখা যেতে পারে। তিনি বলেছেনঃ "সুধু অমুক তারিখে জন্মিলাম, অমুক সনে অমুক কার্য্য-করিলাম, অমুক অমুক তারিখে মরিলাম ইহাতে জীবনী সম্পূর্ণ হয় না। আর সকল জীবনীতেই বিশুদ্ধ চরিত্র কার্য্যদক্ষতা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়—সরল, দেশহিতৈষী ইত্যাদি গুণেরই দ্বিপক বেহাগ ললীত, ভৈরবী রাগের গান,—ছৌতাল ধামাল ধ্রূপদ' আড়াঠেকা বাজনার সহিত শুনিতে পাই। কিন্তু আমার মত হতভাগার জীবনীর ন্যায়'—সত্ অসত্ পাপতাপ ভালমন্দ পরিপূর্ণ জড়িত জীবনী এ পর্য্যন্ত কাহার শুনিনাই—দেখিনাই। —......আমার জীবনীর দাগধরা।"[১৫] মীরের এ দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে লেখকের উদ্দেশ্য মোটামোটি বোঝা যায় এবং তিনি সে তাঁর "দাগধরা" জীবনীকে অকৃত্রিম নিষ্ঠায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন একথাও বলা যায়। এটা যদি তাঁর গুণের দিক হয় তাহলে তাঁর দোষের দিকও আছে। লেখক তাঁর জীবনের ঘটনায় গ্রন্থনায় গল্পরস, নাটকীয়তা প্রভৃতির আশ্রয় একটু বেশী পরিমাণেই নিয়েছেন। এজন্য তাঁর বস্তুনিষ্ঠা ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে বই সুখপাঠ্য হয়েছে। আত্মজীবনী আমাদের কাছে উপন্যাসের রমণীয়তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আত্মজীবনীর জন্য এটি ক্রটি হিসাবেই বিবেচ্য।

এধরনের একটি ক্রটির উদাহরণ পেশ করছিঃ "জঙ্গলে যাইয়া সকলেই শিকার খুঁজিতেছে,—দৈবাত এক প্রবীন শূকর তাঁহার সম্মুখে পড়িল। শিকার সম্মুখে পড়িতেই তিনি তাঁহার অভ্যাসমত দুইটি বল্লম দুই বগলে

১৫। প্রাগুক্তঃ আমার জীবনীর পাঠক কে? পৃঃ ২-৩

চাপিয়া আপন কায়দামত শূকরের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন। তিনি হস্তস্থিত বল্লম দূর হইতে নিক্ষেপ করিয়া শূকর মারিতেন না। শূকরের গোঁ বুঝিয়া তাহার সম্মুখে বর্ষা বগলে দাবিয়া বসিয়া পড়িতেন। শূকরকে গালাগালি দিয়া—আঁও। বলিয়া ডাকিতেই শূকর গোঁ ভাবে তাহার সুধার দন্ত চাকি বাহির করিয়া মীর এবরাহিম প্রতি ছুটিয়া আসিল। প্রথম দক্ষিণ হস্তের বল্লম দ্বারা শূকরের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেই শূকর দন্ত দ্বারা বল্লমের ছড় জোরে কামড়াইয়া ধরিয়া চক্ষের পলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। শিকারী তৎক্ষণাৎ বাম হস্তের বল্লম দ্বারা পুনরায় শূকরের বক্ষ ভেদ করিতেই সে বল্লম দণ্ড (ছড়) খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিল।[১৬]

ওপরের বর্ণনাটি চমৎকার, আত্মজীবনীর পক্ষে হানি কর নয়। কিন্তু এ বর্ণনাকে প্রেক্ষিত হিসাবে ব্যবহার করে লেখক এব্রাহিমের পরবর্তী কার্যক্রমকে স্বাভাবিক ও বিশ্বস্ত করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন বলে মনে হয়। অভিজ্ঞ উপন্যাসিকের মতই তাঁর এ নৈপুন্য।

প্রাসঙ্গিক অংশটি বর্ণনা করলে আমাদের বক্তব্য আরও খোলাসা হয়ে উঠিবে। এব্রাহিম আনার খাতুনের দেওয়া সম্পত্তি থেকে বেদখল হয়ে শহরে (যশোর) গিয়ে মামলা দায়ের করছেন। কিন্তু শহরে থেকে মামলার তদবির করার মত সঙ্গতি তাঁর ছিলনা। একদিন এক গাছের নিচে শুয়েছিলেন। এক মহিলা নদীতে পানি আনতে যাবার সময় একজন সুপুরুষকে গাছের নীচে শুয়ে থাকতে দেখে কৌতূহলবশতঃ তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে সব জানতে পারেন। সেই মহিলা এব্রাহিমকে বাড়ীতে স্থান দেন। ইব্রাহিম সেই দয়াবতী মহিলার আশ্রয়ে থাকেন, খান আর দিন গুনেন। কিন্তু মামলার কিছুই হয় না।

একদিন এব্রাহিম জেলখানার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখেন যে একদল ডাকাত জেলখানা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। দারোগা-পুলিশ-চৌকিদার ডাকাতদের ধরতে পারছেনা। লাঠির চোটে সাধ্য কী সে ডাকাতদের কাছে

১৬। আমার জীবনী পৃঃ ১০

ভিড়ে। জেলায় বিলাতী হাকিম অশ্বারোহণ পূর্বক স্বয়ং এ অভিযানে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ। ডাকাতরা খালি মাঠের কাছাকাছি এসে পড়েছে, আর তাদের ধরা যাবে না। সাহেব হুকুম দিলেন, যে পার ধর, পুরস্কার দিব, চাকরী দিব। এব্রাহিম একখানা লাঠি এক দারোগার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে "আলী আলী কাছাড়িয়া ডাকাত দলের মধ্যে পড়িলেন—। চক্ষের পলকে দুই ডাকাতের মাথা ফাটিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। আর পায় কে? মার মার করিয়া আর আর লোক সকল ডাকাত দলে পড়িয়া লাঠির ঘায়ে সকল ডাকাতকে মাটীতে পাড়িয়া ফেলিল। মীর এব্রাহিম হোসেন তখন মাটীতে পড়া ডাকাতদিগকে কাপড় দিয়া পিট মোড়া করিয়া বান্দিয়া ফেলিলেন।"

এভাবেই এব্রাহিম হোসেন মহকুমা হাকিমের দৃষ্টিতে পড়েন এবং তাঁর নিজের পক্ষে মোকদ্দমায় রায় গ্রহণ পূর্বক সরকারী লোকজনসহ জমিদারী দখল করতে যান।

এব্রাহিম হোসেনের বীরত্বকে বুঝি—বাস্তবে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তাও বুঝি, কিন্তু আত্মজীবনীর ঘটনায় গ্রন্থনায় এ ধরনের যোগাযোগকে অনেকটাই যেন কল্পনার মিশেল বলে মনে হয়।

লতিফন ও মীরের মধ্যে পত্র বিনিময়, লতিফনের স্বপ্ন দেখা প্রভৃতির মধ্যেও কল্পনার অংশ বুঝি কিছু কম নয়। একেই আমরা ওপরে ত্রুটি বলে উল্লেখ করেছি।

মীর জোলফেকার আলীর জামাই সাগোলামাজম সম্পর্কে লেখকের উষ্মা আত্মজীবনীর নির্লিপ্তিকে ব্যাহত করেছে। 'আমার জীবনী'তে সাগোলামের প্রসঙ্গ বেশ কয়েকবার উত্থাপিত হয়েছে এবং সে সব অংশ লেখা হয়েছে কলারীতির প্রতি শ্রদ্ধা না রেখে। সাগোলামের প্রসংগ এতবার উত্থাপন না করলেই ভাল হত।

মশাররফ হোসেনের বিবাহ বিপর্যয় কালীন সময়ে সাপুড়ে ভূতের

ওঝার সঙ্গে তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শনকে অনেকটা বেমানান বলে মনে হবে। জীবন কাহিনীর ট্রাজিক পরিণতির সঙ্গে এ অংশ খুব একটা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

মীরের বইয়ের প্রশংসনীয় অংশও অনেক। যদিও এ বই লেখা হয়েছে এমন এক সময়ে যখন তাঁর শিল্প নৈপুণ্য অবক্ষয়মুখী। তবু পরিপাটি করে কাহিনীকে গেঁথে তোলার পারঙ্গমতা তিনি হারান নি। আন্তরিকতার গুণে বর্ণনা মনোরম এবং উপভোগ্য ও কোথাও কোথাও লেখকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্পর্শে দ্বন্দ্ব-মধুর। মূলতঃ এ বইয়ের প্রধান গুণ এই যে লেখক নিজেকে রক্ত মাংসের স্বাভাবিক মানুষ হিসাবেই উপস্থিত করেছেন। এবং এর ফলে বইটি জীবনের স্বাদযুক্ত হয়েছে।

'আমার জীবনী' থেকে কিছু অংশ চয়ণ করছি ; (ক)··· 'পণ্ডিত মহাশয়ের মুখখানি বেশ হাসো হাসো দেখাইত। আর মাষ্টার মহাশয় যেন জেন্ত, মানুষ বাঘ। আমি কখনও সে মুখে হাসি দেখি নাই। চক্ষু তেড়াই আছে। বেঞ্চের নিকট হইয়া চলিয়া গেলেই প্রাণের মধ্যে কাঁপিতে থাকিত, মুখ চোখ বাঁকা করিয়া যখন বলিতেন, কা ম এণ্ড—কোয়াইট। কোয়াইট বলিয়া মাথায় এক ঝাঁকি মারিতেন, সে সময়ে চক্ষু নিচে ঘাড় নিচে করিতাম।'[১৭]

(খ) 'নবাবের স্কুল, মাষ্টার পণ্ডিত নবাবের চাকর। লিখা পড়াও নবাবী ধরনের হইবে, বুঝিতেই পারিতেছি। তাহার পর বড়লোকের হুকুমদারী করিতে হইবে। হুকুমে উঠিতে হইবে, হুকুমে বসিতে হইবে, উঠিতে হইবে। সর্বোপরি আর এক মহাবিপদ, আমোদ-প্রমোদের লোভ, আরও নানা প্রকারের প্রলোভন সেখানে মজুত রহিয়াছে, নিত্য নতুন আমদানী। সেই জঘন্য স্থানে কি বিদ্যা শিক্ষা সম্ভবে? বিশেষ আমার মত আমোদ প্রিয় লোকের। গান বাজনা শুনিতে আমার স্বভাবজ বাসনা। গান বাজনার আওয়াজ শুনিলেই মন নাচিয়া উঠে। সেস্থানে উড়িয়া

১৭ প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫৩।

যাইতে ইচ্ছা হয়। যৌবনের অঙ্কুরে, বয়স দোষে নূপুর অথবা জোড়ামলের ঝনঝনী মতিচুরের কনকনী শুনিলেই দুই কান পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা করে। সে আওয়াজ আমার কানে যেন মধুমিষ্ট সহিত মিশ্রীর শিরে ঢালিয়া দেয়। হাটিয়া হউক, দৌড়িয়া হউক, হামাগুড়ি দিয়া হউক, সেই মন মাতান, প্রাণ মজান, শব্দের খোঁজে যাইতে ইচ্ছা হয়।'[১৮]

(গ) 'পিতাত কিছুতেই সম্মত হইবেন না। তবে তিনি বেশী পরিমাণে কিছু টাকা পাইলেই সম্মত হইতে পারেন। আমার বিবাহ দিয়া কিছু টাকা হস্তগত করিবেন, তাঁহার কথার ভাবে অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি, ঋণদায় হইতে মুক্তি হইবেন ইহাই তাহার মনের বাসনা, নাজীর সাহেব টাকা দিবেন না। আমাকে যদি হাত করিতে পারেন তবে টাকা দিবেন কেন? আমার দশা যে কি হইবে সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।'[১৯]

আমার জীবনীর ভাষা

ভাষা শিল্পী মশাররফের এক অনবদ্য রূপ এ বইয়ে বিধৃত। এর ভাষা আধুনিক, চিত্রধর্মী ও জীবন ঘনিষ্ঠ। মশাররফ হোসেনের ভাষার বিবর্তনের রূপটিকে বোঝার জন্যও এ বইয়ের মূল্য কম নয়। ভাষার ক্ষেত্রে মশাররফ হোসেন যে তাঁর যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন নীচের উদ্ধৃতি গুলিতে তার প্রমাণ আছে। মীরের হাতে নিরাভরণ কিন্তু উজ্জ্বল গদ্য শিল্প গড়ে উঠেছে। উদাহরণঃ

(১) 'নৌকার দাঁড়ী মাঝিরা নৌকার নিকটেই উনন জ্বালিয়া ভাত রাধিতেছে। ··· মীর এব্রাহিম বসিয়া আছেন। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা মাটীর কলসী কাঁকে এক হাত পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া নদীর ঘাটে আসিয়া জলে নামিতেছে, বস্ত্রাবৃত হইয়াই জলে ডুব দিতেছে, গা মাজিতেছে, চুপে চুপে দুই একটি কথা কহিয়া ভিজে কাপড়েই কলসী ভরিয়া মাথা মুখ ঢাকিয়া

১৮ প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬৪

১৯ ঐ ৩১৫

চলিয়া যাইতেছে। সে সময় চরখার হাত কাটা সূতায় গ্রাম্য জোলহারা হাত তাঁতে যে কাপড় বুনাইত, তাহাই সকলের ব্যবহার্য ছিল। সে কাপড় গৃহস্থ মেয়েদের বিশেষ উপযোগী। একখানা কাপড় হইলে এক বৎসর যাইত। সে কাপড় এত পুরু ঘন বুনান যে জল বাঁধিয়া এক ক্রোশ পথ অনায়াসে লইয়া যাওয়া যাইত।'[২০]

(২) "ঐ যে বড় বটগাছ দেখা যাইতেছে ঐ চুঁয়াডাঙ্গা গ্রাম। এক পোয়া পথ গেলেই পাকা মসজিদ দেখিতে পাইবে, তাহার পরেই জমিদার জর্দ্দার দিগের পাড়া। ক্ষুধায় মাথা ঘুরিতেছে। প্রাণের দায়ে কি করা? যথাসাধ্য ত্রস্তপদে কিছুদূর হাঁটিতেই মসজিদের সাদা রঙ্গ নজরে পড়িল। ক্রমে গ্রামের মধ্য যাইয়া অনেক ঘুরাফেরার পর এক বড় বাড়ীর বাহির বাটীতে তিন মূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইলাম। বাহিরের বৈঠকখানা ঘরের সানবান্দা বারান্দার উপর পাটির বিছানায় স্থূলকায় সুন্দর সুপুরুষ একজন বসিয়া আছেন, কয়েকজন বাজে লোকও অন্য বিছানায় বসিয়া আছে। আমরা আসিয়া খাড়া হইলেই পরিচয় আরম্ভ হইল। কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি, ইত্যাদি অনেক সওয়াল করিলেন। উত্তরও শুনিলেন। আমরা দুটি ভাতের কথা বলিলে মুখখানি বাঁকা করিয়া বলিলেন, অহে বাপু! বাজার আছে যাহা ইচ্ছে সেখানে গিয়ে খাও। এখানে তোমাদের জন্য রান্না করিয়ে রাখা হয় নাই।'[২১]

(৩) 'চাচা বাসাতেই ছিল। মাথায় বাবরি চুল লাল রঙ্গের তসরের ধুতি পরণে, গায়ের উড়নি মাথায় জড়ান। ১৮টা সোনা রূপার তাবীজ লাল সূতায় গাঁথা, হাতে বাঁধা তাহার সঙ্গে একগাছা রূপার তাগা। মাজার উপরে রূপার গোট চক্‌চক্ করিতেছে। দাঁতে মিসি। একশ কথার পর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বিশেষ দিব্বি দিয়ে বারণ করেছি যে আমার পরিচয় দিওনা। বলিও কুষ্টিয়া স্কুলের একটি ছাত্র। কুষ্টিয়ার

---

২০ প্রাগুক্ত পৃঃ ৬০

২১ ঐ ২৫৭

নিকটেই বাড়ী। ইহার বেশী আর একটি অক্ষরও পরিচয় দিওনা। সঙ্গিরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল। ছোট একখানি খাপরার ঘরে মেঝেয় একটি স্ত্রীলোক আধবয়সী—চাচার বয়সের অনেক বড়, দাঁত আছে কিনা অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই। চুলগুলি সম্পূর্ণ কাল নহে বোধ হইল। শেষে জানিতে পারিলাম চাচাজী এই রূপসীর ভালবাসার খাতিরে আর দেশে যান না।'[২২]

এ বইয়ের ত্রুটি

'আমার জীবনী'তে মশাররফ মানসের যে রূপ বিধৃত হয়েছে তা বেশ জটিল। শুধু এই একটি বইয়ের আলোকে তাকে ব্যখ্যা করাও সম্ভব না। কারণ এ বইয়ের রক্ষণশীলতার সঙ্গে রয়েছে প্রগতিশীলতা, আলৌকিকতা, বিজ্ঞান-বিরোধিতার সঙ্গে সুস্থ জীবনচেতনা। এ ছাড়াও আছে প্রগলভতা, স্থূলরসিকতা, স্ববিরোধিতা, পুনরুক্তি দোষ, ভাষা ও ব্যাকরণ-দুষ্টি, প্রভৃতি।

(ক) বিজ্ঞান বিরোধিতা॥ 'মহাপ্রাজ্ঞ প্রবীণ প্রাচীন নাম ডারউইন মহোদয় যে মীমাংসা করিয়াছেন, এতকাল পরে তাঁহাকেই কি, সেই বিপিনবিহারী মহোদয়কে কি—সেই আদি স্থানে বসাইব? কি বলেন? সেই মহাজ্ঞানী পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ, জাতির কথায় কি শাখামৃগ বাহাদুরকে আজি জন্মদাতা স্বীকারে মরকট দলের সহিত সম্বন্ধ পাতাইব? ছি ছি কি ঘৃণা! কি লজ্জার কথা। মানুষ হইয়া বানরের বংশধর স্বীকারে জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজ্যের অধিকারী হইব। "নাউজ বিল্লাহ্'।[২৩]

(খ) 'বুদ্ধি চালনা করিয়া অনুমানের ওপর নির্ভর করিয়া অনেক চিকিৎসক ডাক্তার হাকিম বুদ্ধি খাটাইয়া যৎকিঞ্চিত লিখিয়া গিয়াছেন। মানব জন্মের রহস্য কথা কলমে কাগজে আঁকিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সকল খাঁটী খবর নহে।'[২৪]

২২ প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬০
২৩ ঐ ৮৯
২৪ ঐ ৯২

অলৌকিকতা ॥ অলৌকিকতার প্রতি মীরের একটি সাধারণ দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। এটা অবশ্য প্রাক্-ধনবাদী সমাজ-মানসেরই বৈশিষ্ট্য। মীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক ধনবাদী সমাজের মর্মবাণীকে পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করতে না পারায় এ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। 'আমার জীবনী' থেকে অলৌকিকতার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

(১) সৈয়াদ সাহুল্লা মৃত্যুর সময়ে তাঁর কবর উত্তর-দক্ষিণের পরিবর্তে পূর্ব-পশ্চিমে করে দেবার জন্য তাঁর ছেলেদের বলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেরা ওলেমাদের পরামর্শ নিয়ে কবর যথারীতি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করেই দেন। কিন্তু পরদিন সকালে নাকি দেখা গেল করর পূবে-পশ্চিমে লম্বা। ছেলেরা রাতে স্বপ্ন দেখল তাপস-প্রবর তাঁর ঐশী ক্ষমতায় কবর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা করে নিয়েছেন। কারণ এতে তাঁর উপাসনার সুবিধা। এই অসাধ্য সাধন করতে যেয়ে তিনি বিশেষ কষ্ট পেয়েছেন এবং এজন্য ছেলেদের অভিশাপ দিয়েছেন।

মীর অবশ্য রাস্তার হদিস দিয়ে বলেছেন কবরটি বর্তমান রয়েছে, যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

(২) গৌরনদী প্রসঙ্গে বলতে যেয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একজন দাসী ছিল। একদিন ব্রাহ্মণ গঙ্গা স্নান করতে যাবেন তখন দাসী ব্রাহ্মণের হাতে একটি ফুল দিয়ে সেটি মা গঙ্গাকে নিবেদন করতে বলে। ব্রাহ্মণ গঙ্গা স্নান সেরে প্রায় অর্ধেক পথ চলে এসেছেন এমন সময় তার মনে হল গৌরীর (দাসী) ফুলত মা গঙ্গাকে দেয়া হয় নাই। কি করবেন ভাবছিলেন এমন সময় দেখলেন একটি গরু ওই রাস্তা দিয়ে চলে গিয়েছে, এবং রাস্তায় পায়ের খুরের দাগ রয়েছে। সেই খুরের দাগের মধ্যে জলও জমে আছে। ব্রাহ্মণ সেই জলের মধ্যে গৌরীর পুষ্পটি নিবেদন করা মাত্রই দেখেন, কি অপরূপ মহিমা! দেবী হাত বাড়িয়ে গৌরীর পুষ্পটি গ্রহণ করছেন। ব্রাহ্মণ অবাক বিস্ময়ে বাড়ী

ফিরে এসে গৌরীকে বল্লেন: "মা! তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমাকে এত দীর্ঘকালেও চিনিতে পারি নাই। মা আমাকে তোমার চরণ তলে স্থান দাও।" কিন্তু গৌরী কোন কথা না শুনে বাড়ী থেকে ছুটে চলল। তারপর যে নদীতে সে অদৃশ্য হল তারই পরবর্তী নাম গৌরী। ব্রাহ্মণ তার পেছনে পেছনে ছুটে শেষে মৃত্যু বরণ করে।

পুনরুক্তি দোষ॥ পুনরুক্তি দোষ এ বইয়ের আর একটি প্রধান দুর্বলতা। লেখকের কতগুলি মুদ্রাদোষ আছে যথা: মনের কথা, দুশ বাহবা, ধোঁকা প্রভৃতি। বইয়ের বিভিন্ন অংশে এগুলি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'পিতা চিরকালই ইংরেজ ভক্ত'—বাক্যটি ১২২ পৃষ্ঠাতে দুবার আছে। মীরের পিতার সঙ্গে যে নীলকর টি, আই, কেনীর "গাঢ় প্রণয়" ছিল একথা ১০৮ পৃষ্ঠায় পাঁচ লাইনের মধ্যে দুবার আমরা লক্ষ্য করি। 'আমাদের দেশে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই বিবাহ করিতে হয়।' এবং 'আমাদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই বিবাহ।'—বাক্য দুটি ৩৪৭ পৃষ্ঠায় ৩ লাইনের মধ্যে আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। সাগোলাজমের কথা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় বলেছেন, একথাটি ১২২—১৩৪ পৃষ্ঠার মধ্যে তিনবার পাই। এ ছাড়াও সুযোগ পেলেই সাগোলামের বিরুদ্ধে মনের ঝাল মিটিয়েছেন বহুবার। বইয়ে ভাষা ও ব্যাকরণগত ভুল অনেক, বানান ভুল অসংখ্য।

অসঙ্গতি॥ 'তুমি আমার বয়সের বার ভাগের এক ভাগের সমানও নও। আমি তোমার পিতার সমবয়সী' (পৃঃ ৪১)। মীর এব্রাহিম হোসেনকে ইংরেজ হাকিম একবার 'আপনি' একবার 'তুমি' সম্বোধন করছেন (পৃঃ ৫৩)। মীর বিয়ে করেন ১৮ বছর বয়সে। কিন্তু তিনি যখন কলকাতায় নাজির হোসেনের বাসায় আসেন তখনকার বর্ণনা দিতে যেয়ে লেখক বলেছেন: 'প্রায় ২০ বছর বয়স হইয়াছে' (পৃঃ ৩০৫), ইত্যাদি।

অস্পষ্টতা॥ বইয়ের অনেক জায়গায় অস্পষ্টতা আছে। তার কিছুটা

লেখকের প্রকাশ ক্ষমতার দুর্বলতার জন্য, আবার কিছুটা ছাপাখানার ভূতের কল্যাণে দাঁড়ি-কমার হেরফেরের জন্য। এক জায়গায় লেখক বলছেন 'রবি ঠাকুর খুব সদাশয় সকলেরই খুব উপকার করেন' কারণ বশতঃ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারেখার করিয়াছেন। এমন শক্ত ঠাকুর তাঁহার দ্বারা চিত্র করাইয়া লইতেছেন (পৃঃ ৮৮)। এই রবি ঠাকুর যে রবীন্দ্রনাথ নন সূর্য দেবতা একথা বোঝা খুব সহজ নয়। লেখকের এলাকার জমিদার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাছাড়া 'সদাশয়' ও 'তাঁহার' শব্দদুটিও পাঠককে বিভ্রান্ত করে। এ ধরনের ব্যবহারও ঠিক হয়নি, কারণ যখন এ বই প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ এতটা বিখ্যাত হয়েছেন যে 'রবি ঠাকুর' বল্লে তাঁর কাছে সূর্যও ম্লান।

নীলকর প্রসঙ্গ

নীলকর প্রসঙ্গে মীর-মানসের সংকট ঘণীভূত হয়েছে বলে মনে করা হয়। আমরা এ ব্যাপারে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করি। নীলকর প্রসঙ্গে মীরের সংকটকে আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল, সর্বশেষ বিশ্লেষণে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে মীরের সহানুভূতি ছিল নীল বিদ্রোহীদের প্রতি।

মীর পরিবার বংশানুক্রমে নীলকরদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এক সময়ে মীরের কোন এক পূর্ব-পুরুষ একজন নীলকরের কান কেটে নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বোধ করি উভয় পক্ষের স্বার্থগত কারণে একটা সমঝোতা হয়। সমকালীন যে সমস্ত জমিদার নীল চাষের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে উদার হওয়া সত্বেও শ্রেণী স্বার্থের উর্ধে উঠতে পারেন নি।[২৫]

২৫ "I beg to state that I have several Zemindaries in various Districts and that I have found the cultivation of Indigs and residence of Europeans have considerably benifited the country and society at large." প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্রঃ দীন বন্ধু মিত্র, বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ; পরিচয় দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা (১৩৫৯) কলিকাতা।

মীর পুরোপরি সামন্ততান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন নন আবার উচ্চশিক্ষিত নগরবাসী মধ্যবিত্তও নন। তাই তাঁর সংকট আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তুলনায় তিনি অনেকটা প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে উচ্চশিক্ষিত নগরবাসী হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজও এ ধরনের সংকটে পড়েছেন। এবং সে সব ক্ষেত্রে তাদের রক্ষণ-শীলতাও কিছু মাত্র কম নয়। উদাহরণ স্বরূপ সিপাহী অভ্যুত্থানের কথা বলা যেতে পারে। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত এ ব্যাপারে ইংরেজকে খুশী করার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সে চেষ্টা ছিল হাস্যকর।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা নীলবিদ্রোহীদের সমর্থন করে কিন্তু সিপাহী দের অভ্যুত্থানের সময় এ পত্রিকার প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে বাঙালীরা এতে অংশ গ্রহণ করেনি। অন্যপক্ষে স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর 'আসবাবি বাগাওয়াতি হিন্দ' (ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ) বইটিতে মোসলমানের যে এতে কোন দোষ নেই এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' লিখলেন কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর ভূমিকা লক্ষ্য করার মত। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ-চন্দ্রের স্মৃতি সভায় তিনি বলেন: গত ৫৭ সালের মিউটিনির সময়, যে সময় সেপাইগণ রাজ-বিদ্রোহিতা করিয়াছিল, সে সময় হরিশ বাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিবনা। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ অদ্যকার সভার সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরেজ লোক রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্য চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাদের এই অসংগত মতে বিমত করে, তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিলে, তদ্দণ্ডে কাটিয়া

ফেলে। আমরা কোন কীটস্য কীট। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কত চেষ্টা হইয়াছিল। এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের হরিশচন্দ্র, আমাদের হিন্দু বন্ধু হরিশচন্দ্র, আমাদের সাহসী হরিশচন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন। আর দিকে ইংরেজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং ইংরেজ-রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন।"[২৬]

এ প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে (British Indian Association) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন: "Misguided wretches who have taken a part in this rebellion and thereby disgraeed their manhood by draroing arms against the very dynasty whose salt they have eaten, to whose paternal rule they and their ancestors have for the last hundred years owed the security of their lives and properties and which is the best ruling power that we have had the good fortune to have within the last ten centuries and addressing as I am a society, the individual members of which are fully familiar with the thoughts and sentiments of their countrymen and who represent the feelings and interests of the great bulk of Her Majestys native subjects, I but give utterance to a fact patent to us all that the Govt. have done nothing to interefere with our religion, and thereby to afford argument to its enenies to weaken their allegiance."[২৭]

---

২৬ দীনবন্ধু মিত্র ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিত মালা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৬ কলিকাতা, ১৩৬২,

২৭ Calcutta Review—1857—P. P. 393—94.

দীনবন্ধু মিত্র বা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে এ সিদ্ধান্তে অবশ্য আসা যায় না যে এঁরা ইংরেজের অকৃত্রিম ভক্ত। আসলে এ ধরনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এঁদের মানসিক সংকটই প্রকাশিত হয়েছে। এ সংকটকে আমরা ঔপনিবেশিক দেশের মধ্যবিত্তের সংকট বলে আখ্যাত করতে পারি। শ্রেণীগত বিশেষ মানসিকতার জন্য তাঁরা মনের কথাটি খুলে বলতে পারেননি। এখানে আমরা মশাররফ হোসেনের বক্তব্যটিও রাখতে চাই; 'মনের কথা আর কি বলিব? সকল কথা খুলিয়া বলিলে রাজাদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে পারি। মনের কথা মনেই থাকিল।'[২৮] মীরের উক্তিতেও ওই একই মানসিকতা ক্রিয়াশীল।

এই প্রেক্ষিত টুকুর কথা মনে রেখেই নীলকর ও ইংরেজ সম্পর্কে মীরের বক্তব্যকে আমরা যাচাই করতে চাই। প্রসঙ্গত তাঁর বিশেষ সীমাবদ্ধতার কথাও আমরা মনে রেখেছি। যে সীমাবদ্ধতার বৃত্ত মীরকে ঘিরে রেখেছিল তা হ'ল: (ক) নীলকরদের সঙ্গে আর্থিক স্বার্থ; (খ) তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হলেও মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর ভূমিকাই তাঁকে পালন করতে হয়, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত নগরবাসী মধ্যবিত্তের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল মৌলিক এবং সে কারণেই মধুসূদন দীনবন্ধু বা তাঁদের সমসাময়িকদের মধ্যে স্বদেশ চেতনা ও স্বাধীনতার যে আর্তি লক্ষ্য করি মীরে তা প্রাপ্তব্য নয়। দেশ কালের যে বিশেষ স্থানটিতে তাঁর অবস্থান তাতে তাঁর কাছ থেকে এটা আশা করাও অনুচিত।

নীলকর ও ইংরেজ সম্পর্কে মীরের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করছি:

(ক) 'টি আই, কেনীর সহিত পিতৃদেবের বিশেষ প্রণয় ছিল। নীলকর কুঠিয়াল আমাদের দেশে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই মীর সাহেবকে বিশ্বাস করিতেন, তাঁদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন।'[২৯]

---

২৮ আমার জীবনী—পৃঃ ৩

২৯ প্রাগুক্ত পৃঃ ১০৮

(খ) মীরের পিতার কাছে কেনীর উক্তি; 'তাঁহারা (ইংরেজরা) এদেশে কোন কার্য্যের ভার লইয়া আইসা দূরে থাকুক, বেড়াইয়া দেখিতে আসাও ঘৃণা মনে করেন। এদেশে আসিতে নিতান্তই নারাজ। হয়ত এ রাজ্যের খবরই কেহ রাখেন না। যাঁহারা কিছু কিছু খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে এদেশ একটা অসভ্য প্রদেশ। নেঙ্গটার মুলুক। মূর্খ বর্ব্বরের রাজ্য—জঙ্গলী লোকের বাস। আপনি মনে কিছু করিবেন না। আপনার উপকার আপনার বংশের উপকার করিতেই আমি আজ এত কথা আপনার নিকট মন খুলিয়া বলিতেছি।"[৩০]

(গ) 'পিতা চিরকালই ইংরেজ ভক্ত।···নীলের দৌরাত্ম সহিতে না পারিয়া সর্ব্ব সাধারণ প্রজা নীলবিদ্রোহী হইয়াছেন। দীনবন্ধু মিত্র নীল-দর্পণে নীলকরের দৌরাত্ম অংশই চিত্র করিয়া গিয়াছেন। পরিণাম ফল—নীলকরের দৌরাত্ম সহিত পরিণাম ফল—কি প্রকারে বাঙ্গলা দেশের লোক নীল বর্জন করিল। নীলকরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। বৃটিশ রাজ প্রতি কি প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িল। সে সকল বিষয় এক 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে নাই। দীনবন্ধুবাবু ইংরেজের ত্রুটি ইংরেজের কুৎসাই গাইয়া গিয়াছেন। ইংরেজ মধ্যে যে দেব ভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা এবং ভালবাসার ভাব আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নেমক রুটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতন ভোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও সেই ইংরেজ প্রদত্ত টাকার উপসত্ব ভোগ করিতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নুন নেমক এখনও খাইতেছেন সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া যশ বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও দীনবন্ধুর প্রেত-আত্মা বাহবা ভোগ করিতেছেন; ইহাদিগকে কি বলা যায়? ইহারই নাম পাতফোঁড়—যে পাতে খান সেই পাতই ছিদ্র

---

৩০ প্রাগুক্ত পৃঃ ১১০

করেন।'[৩১] এ উক্তি প্রসংঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। দক্ষিণারঞ্জন সিপাহীদের দেখেছেন উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মবিকাশের বাধা হিসাবে। আর মীর মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজকে দেখেছেন মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের পরিপন্থী হিসাবে। ('আমার জীবনী'র প্রকাশকাল ১৯০৮-১০। তৎকালীন রাজনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থার কথা স্মর্তব্য)। তাই মুখোপাধ্যায় আর মীরের বক্তব্যের ভাষা পর্যন্ত একই ছাঁচে গড়া। সমধর্মী শ্রেণীচরিত্রের মূল থেকে স্বতঃসিদ্ধের মত একই ধরনের বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে।

(ঘ) 'নিকটস্থ গ্রামের ভদ্রলোক পরিচিত বড় বড় জমিদার সকলই আসিয়া পিতাকে ধরিয়াছেন যে আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া ইংরেজ পক্ষে রহিয়াছেন কেন? ইংরেজ কি চিরকালই এই দেশে থাকিবে?

"আপনারা কি ইংরেজ রাজ প্রতীয় একথা বলিতেছেন। "না না—সে কথা বলিতেছি না। আমরা নীলকর কুঠিয়াল ইংরেজকেই বলিতেছি।"

"তবে কেন বলিলেন যে ইংরেজ কি চিরকালই এই দেশে থাকিবে। হাঁ নীলকাজ বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজ চিরকাল এদেশে থাকিবে।"[৩২]

দীনবন্ধুর বক্তব্যের শেষাংশ কথা: "ইংরেজ রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে," এবং মীরের পিতার উপযুক্ত বক্তব্যের মিল বিশেষ লক্ষণীয়।

(ঙ) 'এইক্ষণে নীল বিদ্রোহীর কথাই বলিতেছি যে সকল কথা 'উদাসীন পথিক' প্রকাশ করেন নাই তাহাই দেখাইতেছি। ভদ্রলোক জোট বান্দিলে কি হয়? জনসাধারণ কৃষক শ্রেণী—পণ্ডিত মূর্খে এক জোট না হইলে কিছুই হয় না। দেশে বিদ্যার চর্চ্চা নাই, সংবাদ পত্রিকা কাহাকে বলে তাহা কেহই জানেনা। রেল টেলীগ্রাফ নাই।'[৩৩]

---

৩১ প্রাগুক্ত পৃঃ ১২২
৩২ ঐ ১২২-২৩
৩৩ ঐ ২২৫

(চ) 'প্রজা জমিদার তালুকদার নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে কতই নাজেহাল হইয়াছেন, কত অপমান ভোগ করিয়াছেন—তাহা উদাসীন পথিক দেখাইয়াছেন। কিন্তু একটি নীলকরের প্রধান অত্যাচার বিষয় একটি ঘটনা লিখিতে বোধ হয় অবসর পান নাই।—আমরা সন্ধানে জানিয়াছি, যে উদাসীন পথিক সে ঘটনার বিষয় পূর্বে জ্ঞাত ছিলেন না। মনের কথা প্রকাশ হইলে শুনিয়াছিলেন,—নিজে সে গ্রামে যাইয়া প্রাচীন লোক-দিগের নিকট এই ঘটনার তত্ত্ব লইয়াছিলেন। পুস্তক ছাপাখানা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে আর কি করিবেন। এই উপস্থিত সুযোগে সেই ঘটনাটি আমরা চিরকালের জন্য আঁকিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"[৩৪]

ঘটনাটি এরকম। টি, আই কেনীর সহযোগী তিনি কেনীর পক্ষে মীরপুর (কুষ্টিয়া) কুঠির কার্য পরিচালনা করতেন। সালঘর মধুয়ার কুঠিই প্রধান কুঠি ছিল। এর অধীনে আরও কতগুলি কুঠি ছিল। মীরপুর কুঠি তার একটি। মীরপুরের নীলকরের দৃষ্টি পড়েছে গ্রামের একটি বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়ের প্রতি। 'তখনই তদবির তখনই কার্য্যারম্ভ। কোটনা কুটনী দুই রকম লোকই কুঠিতে আছে, নিযুক্ত হইল। তাহাদের ঘোরাফেরা হাঁটাহাঁটির পর বাড়ীর লোক পাড়া প্রতিবেশী সকলেই সাহেবের দুরাভি-সন্ধির কথা শুনিয়া কি উপায়ে দুরান্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে কুমারী কন্যাকে রক্ষা করা যায়—তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল।'

সাহেবের লোকদের কিছু টাকা পয়সা দিয়ে খুশী করে তাদের দিয়ে সাহেবকে বলে পাঠান হল যে মেয়েটি অসুস্থা। এদিকে খুব গোপনে তার বিয়ে ঠিক করা হল। কিন্তু সে খবর সাহেবের কাছে গোপন রইলনা। সাহেব তার বকসী জমাদারকে ডেকে বল্ল: 'আমার হুকুম খুন জখম সমুদায় আমার জিম্বা। আমি তোমাদের নিকট···গ্রামের··মেয়েকে আজ রাত্রে চাই। তাহার বিবাহ হইতেছে।' এর পরের দৃশ্য: 'পাত্রির বাড়ীতে

৩৪ প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৬

বরযাত্রীসহ বর আসিয়াছে। সন্ধ্যা রাত্রিই বিবাহের লগ্ন।…কন্যা কর্ত্তারা শীঘ্র শীঘ্র বিবাহের আয়োজনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ছাওনাতলায় বর চেলির জোড় পরিয়া উপস্থিত। পাত্রিয় উপস্থিত।…পোরত ঠাকুর মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। এমন সময় হো হো মার মার শব্দে মশাল জ্বালিয়া দুইশত লাঠিয়াল ঢাল, সড়কি, তরবারী, লাঠি বল্লম লইয়া একেবারে ছাওনাতলায় উপস্থিত। এক প্রকারের বিরাট চিৎকারের সহিত দশ বার জন লাঠিয়াল পাত্রিকে ধরিয়া শূন্যে শূন্যে লইয়া যেন অন্তর্দ্ধান হইল।…বরের মাথা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল।'

কেনীর সহযোগী এই নীলকর তার নৃশংস ও বর্বরোচিত কার্যের দ্বারা যে 'আমাদের ঘৃণা অর্জন' করে একথা বলাই বাহুল্য। কেনী ও তার সহযোগী যে 'উড্ রোগেরই দোসর।'[৩৫] তাতে আর সন্দেহ কি!

(ছ) '৮০ বছর পূর্বে ঐ গ্রামে, দেশ বিখ্যাত জমিদার প্যারিসুন্দরীর নাম দেশময় হইয়াছিল।……প্রিয় পাঠকগণ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র ৯ পৃষ্ঠা হইতে তৃতীয় তরঙ্গ প্যারিসুন্দরী প্রস্তাব আরম্ভ হইয়া ষষ্ঠ তরঙ্গ পর্য্যন্ত তাহার পর দশম তরঙ্গ দ্বাদশ তরঙ্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই প্যারীসুন্দরীর দয়া প্রজারক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ-স্বীকার ইত্যাদি অনেক গুণের প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।'[৩৬]

(জ) 'এই প্রকার কত অত্যাচার কত দৌরাত্ম্য, এই বাঙ্গালা মুলুকে স্থানে স্থানে ঘটিয়াছে তাহা গণনা করিয়া প্রকাশের সাধ্য কাহারও নাই।—দৌরাত্ম্য, অবিচার, স্বার্থপরতার শেষ সীমা পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে, সাধারণ প্রজার মনে একতার ভাব উদয় হয় না। প্রজা নীল কুঠির অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া জোট বদ্ধ হইল। শেষে কার্য্যও করিল

৩৫ দ্রঃ উদাসীন পথিকের মনের কথা (মীর-মানস পৃঃ ৫৪)
মুনীর চৌধুরী—প্রাগুক্ত।

৩৬ আমার জীবনী—পৃঃ ৭৬—৭৭

সফলকামও হইল। সমুদয় নীলকুঠি দেউলিয়া— ঋণদায়ে সমুদায় জমিদারী দালান-কোঠা নীলাম হইয়া গেল।"[৩৭]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহের মধ্যে মীরের অতি-আধুনিক বক্তব্য যেমন তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল (প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যের উৎস দুটি, যথা: (ক) সামন্ততান্ত্রিক চেতনা; ও (খ) মুসলিম মধ্যবিত্তের উদ্ভবের ফলে হিন্দু মধ্য-বিত্তের সঙ্গে দ্বন্দ্বজাত) উক্তি ও রয়েছে। এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তৎকালীন হিন্দু ও মুসলিম উভয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই এ ধরনের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যাবে। মীরের এই মানস-দ্বন্দ্বের যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য তাঁকে সমাজের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে বিচার করাই বাঞ্ছনীয়। তাঁর শ্রেণীগত স্বার্থ চেতনা, তাঁর শিক্ষাদীক্ষার পরিমণ্ডল ও তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থার কথা মনে না রাখলে মীরের মূল্যায়নে ভ্রান্ত পথে পা রাখার সম্ভাবনা। আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মীরকে দেখতে চেয়েছি।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যে সর্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যাবে, মীর নীল বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আপাত বিরোধী উক্তি সমূহকে একটু ব্যাপক প্রেক্ষিতে স্থাপন করেই আমরা তাঁর 'মনের কথা'কে বুঝতে চেয়েছি। এ ছাড়াও 'ভারত মহিলা' পত্রিকার বৈশাখ-শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩১৪) প্রকাশিত 'প্যারী সুন্দরী' নামক প্রবন্ধ,[৩৮] জলধর সেনকে 'নীল বিদ্রোহ' সম্পর্কে বিস্তৃত 'নোট' দানের ইচ্ছা প্রকাশ,[৩৯] ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় বাদ পড়ে যাওয়া একটি প্রধান ঘটনার 'আমার জীবনী'তে অন্তর্ভুক্তিও আমাদের সিদ্ধান্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

---

৩৭ ঐ পৃঃ ১৩৩

৩৮। সাহিত্য সাধক চরিত মালা, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২

৩৯। অধ্যাপক (বর্তমানে ডক্টর) আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত জমিদার দর্পণের (ঢাকা ১৩৬২) পরিশিষ্টে (পৃঃ ১৪) উদ্ধৃত।

ইংরেজ শাসক প্রসঙ্গ

'আমার জীবনী'তে ইংরেজ শাসক সম্পর্কে মীরের যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তাকেও আমরা আক্ষরিক অর্থে সত্য বলে মনে করিনি। কারণ এ সম্পর্কে আমাদের হাতে মীরের অন্য রকম বক্তব্যও রয়েছে। সে বক্তব্যগুলিতে ইংরেজ সম্পার্কে মীরের বিদ্রূপ ও ঘৃণা এতটা সোচ্চার যে 'আমার জীবনী'র উক্তি সমূহকে নির্ভেজাল বলে গ্রহণ করা শক্ত। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি :

(ক) 'বেহুলা গীতাভিনয়ের[৪০] (১২৯৬) দুটি গানে তিনি ইংরেজের আসল রূপটি তুলে ধরেছেন। যথা :

(১) "সকলি যে এক রঙ্গা।
তাহাতেই কি এত মিল।
কোথা হইতে কোথা এসে
করিছে বাদসাই ভাইরে।
ঘুরাচ্ছে জমেরই দণ্ড। ··
... ...
মাথা গুণে নেয় খাজনা।
আমার ডিঙ্গা আমার বাড়ী
তাতেও কিছু দিতে হবে।
পড়েছি কাফেরের হাতে।
উড়ে পুড়ে চলে যাক।"

৪০। আমার সহকর্মী অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সাহেবের কাছ থেকে আমি 'বেহুলা গীতাভিনয়' বইটি দেখেছি।

(২) "অরে ! ভাইরে জাগ জাগ দিন গেল
আর কতকাল এমন করে ঘুমাইবে বলরে।
... ...
আমরা তাদের কাছেরে ভাই শিয়াল আর কুকুর রে ?
এ দেশের সব ধান চাল রাক্ষসেতে খায়।
ছোলা গমে নীল রেসমে পাটে না কুলায় রে।
এমন লক্ষ্মীছাড়া কপালপোড়া দেশত দেখি নাই রে ॥
রাজা কোথা রাণী কোথা কোথাবা উজির।
মেরে ধরে নিয়ে কল্লে পথের ফকির রে ॥
যাত্ রাখেনা মান রাখেনা ধন রাখেনা হায়।
(আবার) ঘুষা নাথির চোটে কত শত প্রাণ যায় রে ॥
পড়েছি বানিয়ার হাতে আরত রক্ষা নাই।
হাড়ে মাস থাকতে কভু ছাড়বেনা বালাই রে ॥[৪১]

(খ) আবার সঙ্গীত লহরীতে[৪২] তিনি বলেছেন :
"ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল।
ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্ব্বনাশ হইল ॥
... ...
যাদের নামে কাঁপিয়াছে বাসুকি পাতালে।
এখন তাদের বুকে মারছে নাথি বানরের দলে রে ॥
বিদ্যাবুদ্ধি সাহস বলে বলী ছিল যারা
শেল কুকুরের মত মারা যাইতেছে তারা রে ॥
যা দেখেছ আছে এখন আরত কিছু নাই।
সুখের দফা শেষ করেছে বিড়াল চখ ভাই রে" ॥

৪১। বেহুলা গীতাভিনয় (১২৯৬) পৃঃ ১১—১৩
৪২। সঙ্গীত লহরী (১২৯৪) সাহিত্য সাধক চরিতমালায় (দ্বিতীয় খণ্ড) উদ্ধৃত।

সমাজ চিত্র হিসাবে 'আমার জীবনী'

সমাজ চিত্র হিসাবে 'আমার জীবনীর' মূল্য অসামান্য। বইটিতে প্রায় দেড়শ বছরের ইতিহাস বিধৃত। এই সময়ের বাঙালী সমাজ বিশেষ করে মুসলিম সমাজের বিবর্তনের ধারাটি বইয়ে বড় চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে। কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

(ক) 'সে সময় সধবা স্ত্রীলোকের নাকে কানে হস্তে কোন না কোন অলঙ্কার থাকিত। সাধারণ কৃষক কারিকর শ্রেণীর হাতে পায়ে কাঁসার অলঙ্কার, জোলহাদিগের হাতে পায়ে দস্তার অলঙ্কার শোভা করিত। অবস্থা ভাল হইলে কানে সাধারণ চাঁদীর ঝুঁমকা ব্যবহার হইত। দক্ষিণ বাড়ী পদমদী অঞ্চল বর্ষাকালে এক প্রকার জলে ডুবিয়া যায় এখনও বর্ষাকালে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতে হইলে অধিকাংশ স্থানেই নৌকার প্রয়োজন হয়। নৌকা অভাবে কলাগাছের মাঁড় বাঁধিয়া ঘরের কানাচে বাঁধিয়া রাখে,—প্রয়োজন মত ব্যবহার করে। বাড়ীর নিকটে যত দিন জল শুকাইয়া না যায়, তত দিন ঐ জলেই সকলে স্নান করে। অনেক গরীব ভদ্রঘরের মেয়েরাও বাড়ীর কানাচির জলে নামিয়া স্নান করিয়া থাকে। যাহাদের বাড়ীর নিকটে নদী, গরীব ভদ্রঘরের মেয়ে হইলেও সে সময়ে নদীতে নামিয়া স্নান করিত। এইক্ষণে অনেক স্থানে পূর্ব্বভাব নাই অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সভ্যতা প্রথা সাধারণ কৃষক গার্হস্থ্য সমাজেও প্রবেশ করিয়াছে। কাঁসার অলঙ্কার ব্যবহার করা দূরে থাকুক, থালা বাটি গ্লাসেও কাঁসার ভাঁজ পাওয়া যায় না। ইনেমেল চিনে কাঁচ কাঁসার বাসনের স্থান অধিকার করিয়াছে। কাঁসা দস্তার স্থানে অঙ্গে সোনা রূপা কাঁচ উঠিয়াছে। সে সময় বিধবার অঙ্গে কোনরূপ অলঙ্কার শোভা পাইত না। এখন আর সেকাল নাই। বিধবা সধবা চেনা ভার।'[৪৩]

---

৪৩ আমার জীবনী—পৃঃ ৪৩

(খ) 'সাধারণ জাতঘর বাটীর মধ্যে সদর আঙ্গিনায় হয় না। কোন নোঙ্গরা স্থানে অথবা কানাচিতে একটু স্থান থাকিলে সেই স্থানে অতি সামান্য ভাবে ৫ হাত দীর্ঘ ৩ হাত প্রস্ত কুঁড়েঘর যেন তেন প্রকারে বাঁধিয়া লতাপাতা খড় কুটা দ্বারা অগ্রেই প্রস্তুত করিয়া রাখে। সে ঘরের মেঝেয় মাটী দিয়া আঙ্গিনা হইতে উঁচু করা হয় না। কেহ কেহ উঁচু করিলেও দুই তিন অঙ্গুলী উঁচু করিয়া মাটী দেওয়া ভিন্ন বেশী পরিমাণ দিতে পারে না। বেড়া চার খানি দেয় বটে কিন্তু সে না দেওয়ার মত। পাতা ডাঁটা গাছ গাছড়া বড় জোর উলুখড়, কি বিচালীর দ্বারা বাঁশের চটা সংযোগে কোন প্রকারে খাড়া করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। প্রসূতীর বিছান বালিস মধ্যে ছেঁড়া মাদুর বা পুরাতন চেটাই। খড়ের আঁটি কি বিচালীর আঁটী বাঁধিয়া অথবা ছেঁড়া নেকড়া একত্র করিয়া তাহারই বালিস করিয়া দেওয়া হয়। আহারের জন্য থালা ঘটী জলপাত্র মাটীর। অথবা এরূপ জঘন্য যে তাহা মনুষ্যের ব্যবহারে রুচি হয় না। আহারের সামগ্রী নূতন প্রকার। যাহা স্বাভাবিক শরীরে কেহ কখনও খায়না—তাহাই। ভাজা চালের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া সামান্য একটু আখের গুড়ের মিষ্টির সহিত ঝালে ঝোলে একত্র করিয়া সেই কিম্ভুত কিমাকার খাদ্য প্রসূতীকে দেওয়া হয়।···প্রসূতীকে কেহ স্পর্শ করে না। খাইতে হয় কলাপাতে নয় অতি জঘন্য পাত্রে। প্রসব করিয়া কি অপরাধেরই যে কার্য্য করে, তাহা কেহই মুখ ফুটিয়া বলেনা। অথচ গৃহিণী জাত ঘরে মনুষ্যের মধ্যেই গণ্য নহে। পশু হইতে নীচ, বাড়ীর পোষা কুকুর হইতেও ঘৃণার পাত্র।'[৪৪]

(গ) 'মাতামহ রঙ্গপুর অঞ্চল হইতে টাকা দিয়া দাসী খরিদ করিয়া পাঠাইতেন। রঙ্গপুর অঞ্চলে সে সময় পিতা কন্যাকে, স্বামী স্ত্রীকে যথেষ্ট টাকা পাইলে, অথবা দীন দুঃখি লোক কন্যা ভগ্নী স্ত্রী বিক্রয় করিত।'[৪৫]

---

৪৪ আমার জীবনী—পৃঃ ৯৩—৯৪

৪৫ ঐ ১০০

(ঘ) 'অক্ষর পরিচয় হইলেই কোরাণ শরীফ পড়ার নিয়ম। সে পড়া পড়িয়া যাওয়া মাত্র, আরবী কোরাণ শরীফের অর্থ কেহই আমাদের দেশে জানিতেন না। এখন পর্যন্ত মোল্লার দল যাহারা কোরাণ শরীফ পড়িয়া পয়সা উপার্জন করে, তাহারাও জানেই না। শুধু পড়িয়া যাওয়া তাঁহাদের শিক্ষা।'[৪৬]

(ঙ) 'আমাদের সমাজে গানের নামেই চটা,—গানের নামেই ছি ছি! শত শত ঘৃণা। উচ্চাঙ্গের মুসলমান শিক্ষিত সমাজে সঙ্গীত ঘৃণার্হ। কাট-মোল্লার দলই বেশী নিন্দনীয়।'[৪৭]

(চ) 'পল্লিগ্রামের বিবাহের পূর্ব্বে কোন ভদ্র ঘরের পরিবার পাত্রীর বাড়ীতে যাওয়া দূরে থাক—সে কথা, কেহ মুখেও আনিতে পারে না। ভাগ্যগতিকে যদি বিবাহ না হয়—তত্রাচ কোন পক্ষেরই কোন প্রকার নিন্দার ভাগী হইতে হয় না। কুমারী কন্যাকে অপর স্ত্রীলোক দেখিয়া গেল, সে কথা বলিয়া যে একটা অপবাদ রটিয়া যাওয়া তাহাও রটেনা।'[৪৮]

এ বইয়ে মীরের প্রগতিশীল দৃষ্টি ভঙ্গী

মীরের মানস-সংকটের সূত্রপাত ১৮৯৫ এর পরে। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে (১৮৯৯) এ সংকট ঘনীভূত। তাঁর ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু তৎকালীন মুসলিম রাজনীতির গতি-ধারাও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে দেখা যায় মীর হিন্দু সমাজ, বিশেষ করে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি (হাকিম, উকিল, মোক্তার আমলা ইত্যাদি) ক্ষুব্ধ। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে হিন্দু সমাজের প্রতি বোধ হয় তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন না। বহু জায়গায় অবশ্য

৪৬ আমার জীবনী পৃঃ ১০৩

৪৭ ঐ ৩২১

৪৮ ঐ ৩৪৬

তিনি 'হিন্দু জাতি' কথাটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু বোঝাতে চেয়েছেন উপরোক্ত বিশেষ শ্রেণীটিকেই।

ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতায় মীর-মানসের সংকট সমকালীন রাজনীতির স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার প্রবল আঘাতে তাঁর কক্ষ-চ্যুতি। কিন্তু মীর এই নতুন চেতনাকে অর্থ পূর্ণ করে তুলতে পারেননি। তাই এ পর্ব সৃষ্টি হীনতায় অনুজ্জ্বল। মীরের জন্য এই নতুন চেতনা ছিল অনেকটাই কৃত্রিম। তাই তাঁর প্রতিভা এতে স্ফূর্তি পায়নি। কিন্তু শেষ দুটি বই যথা 'আমার জীবনী' ও 'বিবি কুলসুমে' তাঁর সাহিত্য জীবনের শেষ পর্বের আবিলতা লক্ষ্য করা গেলেও শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা ও জীবন চেতনার দ্যুতি মাঝে মাঝেই আমরা লক্ষ্য করেছি। আর এজন্যই আমরা এ পর্বকে কৃত্রিম বলে আখ্যাত করার পক্ষপাতী। সে বিষয় বস্তু ও বক্তব্যের সঙ্গে মীরের মানসিক সাজুয্য আছে সে সবের বর্ণনায় তিনি নিপুণ, আধুনিকতার প্রান্তস্পর্শী। লক্ষ্য করুণ:

(১) 'ভদ্রলোক জোট বান্দিলে কি হয়? জনসাধারণ কৃষক শ্রেণী—পণ্ডিত মূর্খে এক জোট না হইলে কিছুই হয়না। দেশে বিদ্যার চর্চ্চা নাই, সংবাদ পত্রিকা কাহাকে বলে তাহা কেহই জানেনা।'[৪৯]

(২) 'পূজনীয় পিতা ঠাকুর তাঁহার মন মত, টাকা আওলা মহাজন গরুরদালাল কি কোন গাঁজার বেপারী কি আফিং এর কারবারী লোকের ঘরে বিবাহ সাব্যস্ত করিয়া আদেশ করিতে পারেন। হল বেপারী, হল কারবারী আমি কোনও ভয় করিনা। ভয় করি কেবল তাহার সহিত যদি আমার মনের মিল না হয়—যদি তাহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা না করে।'[৫০]

(৩)...'আমাদের সমাজের গতি চমৎকার। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। যে সম্বন্ধ উপস্থিত, ইহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি বহু পরিমাণ নির্ভর

৪৯ আমার জীবনী পৃঃ ১২৫
৫০ প্রাগুক্ত ৩১৫

করা কর্ত্তব্য। তাহা সমাজে কৈ? আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে কে? পিতা মাতা ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন। তাঁহারাই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন, যার বিবাহ তার অভিমতের দিকে কেহই লক্ষ্য করেন না। এই যে এক ভয়ানক প্রথা ইহারই জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁন্দে।'[৫১]

(৪) 'আমাদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই বিবাহ। যা কপালে আছে তাহাই হইবে। কানা, খোঁড়া, নুল, অন্ধ কালা হইলেও আর উপায় নাই।...যে ঢোল্ গলায় পড়িল, সাদরে গলায় করিয়া নাচিয়া নাচিয়া তাহাই বাজাইতে হইবে।...স্ত্রী স্বামী মধ্যে সর্ব্বদা কলহ কচকচি, বিবাদ, মারামারী, কাটাকাটি, বর্জ্জন (তালাক), পুনঃ গ্রহণ, ইত্যাদি লইয়া যত ঘটনা হয়, বঙ্গদেশে হিন্দু ভ্রাতাগণ মধ্যে তাহার এক কড়া ক্রান্তিও দেখা যায়না—শুনা যায় না। ইহার কারণ কি? নিরপেক্ষ চক্ষে দেখিলে, বিবাহের পুর্ব্বে দেখাদেখিই ইহার মূল কারণ।"[৫২]

(৫) "গ্রাম্য হিংসুক মুসলমানের বিশ্বাস যে মহাশয়! নিবাস, হিন্দু-দিগের কথা। মুসলমানকে ওরূপ ভাবে কোন পক্ককেশ, পাকাদেড়ে মৌলবী মুন্সী বেশধারী মুসলমান কখনি জিজ্ঞাসা করিবে না। আমি প্রশ্ন শুনিয়াই মুন্সীজির মনের ভাব বুঝিলাম। আমি উত্তর করিলাম, "মহাশয়। আমার নিবাস নদীয়া"—

মুন্সী—তবে কি জাতি আপনি?

উঃ নরজাতি।

মুন্সী—আপনার ধর্ম কি?

উঃ মানব ধর্ম।

... ...

মুন্সী—তাই জিজ্ঞাসা করি আপনি কি হিন্দু?

---

৫১ প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৮

৫২ ঐ ৩৪৭

উঃ হিন্দু অর্থ আপনি কি বোঝেন ? এক অর্থ হিন্দুস্থানে যাহারা বাস করে তাহারাই হিন্দু " [৫৩]

(৬) বিয়ের পর মুর্ছা রোগ গ্রস্থা লতিফনকে দেখতে এসেছেন একজন ডাক্তার। তিনি হিন্দু। তাঁর বক্তব্যকে মীর উপস্থাপিত করেছেন এভাবে : 'আপনাদের (মোসলমানের) মধ্যে ন্যায় বিচারের ভাগ অতি কম। আপন স্বার্থ ভোগ সুখ-লাভ, সন্তোষ নিজের পেট পুরিলেই হইল। অপরের সুখ-দুঃখ, সন্তোষ-অসন্তোষের দিকে লক্ষ্য খুব কম। ঐ বয়সে ওকে বিবাহ করিতে কে পরামর্শ দিয়াছিল মহাশয় ? তারপরে আবার শুনলেম, যে একটি স্ত্রী, পুত্র আর একটি রাখিত স্ত্রীলোক বাড়ীতে ঘরদোর আলো করে বসেই আছন "[৫৪]

---

৫৩ আমার জীবনী পৃঃ ৩৫৮—৫৯

৫৪ ঐ ৩৬৫

পরিশিষ্ট

'আমার জীবনী' অবলম্বনে এ বংশ পীঠিকা তৈরী করা হয়েছে। মীরের সন্তানদের নাম বিবি কুলসুম (মুনীর চৌধুরী সাহেব কর্তৃক উধৃত অংশ দ্রঃ) থেকে পেয়েছি।

বংশপীঠিকা

সৈয়াদ সাতুল্লা
|
চারপুত্র
|
সৈয়দ মীর কুতুবুল্লা

- সৈয়াদ মীর ওমার দারাজ (জ্যেষ্ঠ)
  - মীর এব্রাহিম হোসেন (মীর খয়বাত)
    - মীর জোলফেকার আলী (জ্যেষ্ঠ)
      - হাফিজা খাতুন
        - সুকরননেছা, খত্রননেছা
    - মীর মোয়াজ্জম হোসেন (কনিষ্ঠ)
      - নাসিমা খাতুন
        - মীর আসগর আলী [প্রথম পক্ষের পুত্র, মৃত]
        - দ্বিতীয় পক্ষ:
          - মীর মশাররফ হোসেন
          - মীর মহতেশাম হোসেন বার এট্ ল
          - মীর মকাররম হোসেন
          - মীর বজলাল হোসেন
          - সামছন্নেছা
  - মীর গেরানী
- সৈয়াদ মীর আলী আকবর (কনিষ্ঠ)
  - মীর আলী আহমদ (দারোগা ছিলেন)
    - মীর আলী আশরাফ (খান বাহাদুর—ডেপুটি কালেক্টর)
      - নওয়াব মীর মহম্মদ আলী (চির কুমার ছিলেন) সৈয়াদ আবদাছামাদ } দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান
      - হায়াতন নেছা
        - আফছারুন্নেছা
        - আসমতন্নেছা
        - আবেদন নেছা

বিবি কুলসুমের সন্তান

(১) রওসন আরা (সতি) (২) কন্যা মৃত (৩) মীর এব্রাহিম হোসেন (সত্যবান) (৪) আমিনা খাতুন (কুকি) (৫) সালেহা খাতুন (সুনীতি) (জমজ বোন) (৬) সালেহা খাতুন (সুমতী) (৭) মীর আশরাফ হোসেন (রণজিত) (৮) মীর ওমর দারাজ (সুধন্বা) (৯) মীর মহবুব হোসেন (ধর্মরাজ) (১০) কন্যা ১—? (১১) পুত্র—?